ঋণ দানে দাতা সংস্থার শর্ত দরিদ্রের উপর কষাঘাত
কর বৃদ্ধি নয় বরং দুর্নীতি বন্ধ ও অর্থ পাচার রোধ হোক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

ক. ঋণ নির্ভর জাতীয় বাজেট ২০২৪-২০২৫

বাংলাদেশ সরকার আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রায় আট লক্ষ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করছে, যা চলতি বছরের তুলনায় ১২% বেশি। আগামী অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা যা চলতি অর্থবছরের চেয়ে ১৩% বেশি এবং মোট বাজটের ৬৮%। আগামী অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি রয়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপির ৪.৬% এর সমতূল্য।

এই ঘাটতি মোকাবেলা করার জন্য সরকারকে ঋণ নিতে হবে, যার মধ্যে এক লক্ষ সাতান্ন হাজার কোটি টাকা আসবে ব্যাংকসহ অভ্যন্তরীণ খাত থেকে এবং বাকি এক লক্ষ কোটি টাকা বিদেশি ঋণ।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস শেষে সরকারের করা মোট ঋণের পরিমাণ সাড়ে ষোল লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নেয়া ঋণ সাড়ে নয় লক্ষ কোটি এবং বিদেশি ঋণ সাত লক্ষ কোটি টাকা। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু ঋণ দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। যা গত বছরের চেয়ে ১২,৭৭৫ টাকা বেশি। সরকারকে নতুন বছরে এসব ঋণের সুদ বাবদ শোধ করতে হবে প্রায় সোয়া লক্ষ কোটি টাকা, যা দিয়ে তিনটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যায়।

পরিসংখ্যানে বলছে, পাঁচ বছরেই অভ্যন্তরীণ ঋণ দ্বিগুণ হয়েছে। গত এক দশকে বিদেশি ঋণ পরিশোধ বেড়েছে ১০৮% এবং চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো বিদেশি ঋণ পরিশোধ ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। [*প্রথম আলো, ০৪/০৬/২০২৪*]

প্রতিবছর সরকার রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা শেষ পর্যন্ত আর অর্জন করা হয় না। অন্যদিকে প্রতিবছরই সরকারের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের উচিত এই ব্যয় পর্যালোচনা করে, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করে রাজস্ব ঘাটতি মোকাবেলা করা। কারণ, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা হচ্ছে: (১) চরম মূল্যস্ফীতি। (২) বিগত কয়েক বছর ধরে নিম্নগামী বৈদেশিক রিজার্ভ যা বর্তমানে মাত্র ১৯.২০ বিলিয়ন ডলারে এসে ঠেকেছে। (৩) বৈদেশিক বিনিয়োগ হ্রাস (গত বছর যা ছিল ৩ বিলিয়ন ডলারের সামান্য বেশি এবং ২০২২ সালে ছিল ৩.৫ বিরিয়ন ডলার। সুত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, ২৮ মে ২০২৪), (৪) রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্র অর্জন করতে না পারা, (৫) অর্থপাচার ও দূর্নীতি বৃদ্ধি, (৬) আর্থিক খাতের বিশৃঙ্খলা, (৭) ঋণ নির্ভরতা বৃদ্ধি, (৮) ডলারের বিপরীতে টাকা অবমূল্যায়ন, ইত্যাদি।

খ. বৈদেশিক ঋণের শর্ত দারিদ্র বাড়াচ্ছে

নতুন বাজেটের রাজস্বনীতিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ, আইএমএফ ৩০টি শর্তে সরকারকে ৪.৫ বিলিয়ন ঋণ দিতে রাজি হয়েছে, যার মধ্যে আছে- (১) বিদ্যুৎ, জ্বলানি তেল ও গ্যাসের ভর্তুকি কমানো এবং মূল্য বৃদ্ধি করা, (২) করের হার ও আওতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে ভ্যাট বা পরোক্ষ কর। (৩) ব্যক্তি কর বৃদ্ধি (২৫% হতে ৩০%), (৪) কর্পোরেট কর কমানো (২২% হতে ২০%), (৫) আমদানি শুল্ক কমানো, (৬) ব্যাংক সুদের সিলিং তুলে দেয়া। যার ফলে ব্যাংকগুলো এক অংকের সুদের হার থেকে বের হয়ে নিজেদের সুবিধামতো দুই অংকের চড়া সুদে ঋন দিচ্ছে। এর ফলে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রবাহ কমে গেছে, ও মূল্যস্ফীতি ঘটছে।

একদিকে জনগণের বিশেষ করে কম আয়ের মানুষের কাঁধে যেমন করের বোঝা চাপানো হচ্ছে তেমনি সরকারি সেবায় ভর্তুকি কমিয়ে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। আইএমএফ সরকারের ব্যয় কমানোর জন্য জনসেবা খাতে ভর্তুকি বন্ধ করার পরামর্শ দিলেও দুর্নীতি বন্ধ বা সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানের জন্য কোনো পরামর্শ দিচ্ছে না।

সরকার ভর্তুকি দেয় জনগনের কল্যানের জন্য। কিন্তু, এখন দেখা যাচ্ছে, জনগণের কল্যাণের খাত বন্ধ করে তা কর্পোরেট ও ব্যবসায়িদের লাভে বরাদ্দ করা হচ্ছে। আগামী বাজেটে ভর্তুকি বাবদ ১ লক্ষ ০৮ হাজার ২৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু এই ভর্তুকি কোথায় ব্যয় করা হবে?

আইএমএফ-এর পরামর্শে বিদ্যুতের দাম বছরে চারবার করে আগামী তিন বছরে মোট বারোবার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাতে উৎপাদন খরচের পুরোটাই গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করা হয়। অথচ, এই ভর্তুকির ৩৭% বা ৪০,০০০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ দেয়া হলেও তার প্রায় ৮১% চলে যাবে ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে। যা সরাসরি পাবে, কুইক রেন্টাল নামে পরিচিত প্রাইভেট বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো। বিগত পাঁচ বছরে এই ক্যাপাসিটি চার্জ ক্রমান্বয়ে ৫ গুণ বাড়ানো হয়েছে। যার কারণে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে, এবং এই বাড়তি টাকার পুরোটাই গ্রাহককেই বিদ্যুৎ বিল হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। [*প্রথমআলো: ৫-মে'২৪; ডেইলি স্টার-বাংলা: ৯-জুন'২৪*]।

কর আদায়ে সরকারকে কর ন্যায্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ ধনীদের কাছ থেকে বেশি কর আদায় করে দরিদ্র জনগণের কল্যানে ব্যয় করতে হবে। বিশেষ করে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পানি, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি জীবন রক্ষাকারী সেবায় বরাদ্দ বাড়িয়ে জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

গ. রাজস্ব বৃদ্ধিতে বড় বাধা কালো টাকা এবং অর্থ পাচার

কালো টাকা সাদা করার রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থ বা কালো টাকা। সরকার তা মোকাবেলা করার ফলপ্রসু কোনো উদ্যোগ না নিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় ১৫% কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিচ্ছে। এতে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মধ্যে দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়মকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যা কালো টাকা অর্জন আরও বিস্তার ঘটাবে এবং প্রকৃত কর প্রদানকারীরা নিরুৎসাহিত হবে। মাত্র ১৫% কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়ার বিপরীতে সাধারণ করদাতাদের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ কর দেয়ার বিধান বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ পরিচালিত পৃথক গবেষণায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক অর্থ বা কালো টাকার পরিমাণ মোট জিডিপি'র ৪৮% হতে ৮৪% পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এর গড় হার ৫০% বিবেচনা করলেও চলতি অর্থবছরে ছায়া অর্থনীতির পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি, যা উক্ত বছরের জাতীয় বাজেটের প্রায় সাড়ে তিন গুণ। কালো টাকার অর্থনৈতিক কার্যাবলি উন্মোচন করা গেলে একদিকে যেমন জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, দেশি-বিদেশি ঋণ

গ্রহনের প্রবণতা কমবে, প্রত্যক্ষ কর আদায়ের হার বৃদ্ধি পাবে এবং পরোক্ষ কর (ভ্যাট) হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে, এবং ঘাটতি বাজেটের আশংকা হ্রাস পাবে।

অর্থ পাচার কতটুকু বন্ধ হয়েছে?

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির তথ্য অনুযায়ী গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে মোট পুঞ্জীভূত কালোটাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৩২ লাখ কোটি টাকা, আর পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ ১১ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকা। সেখান থেকে আগামী অর্থবছরে যদি কালোটাকার মাত্র ০. ৯৮% এবং পাচার হওয়া অর্থের ০.৪৯% উদ্ধার করা যায়, তাহলে সরকারের আয় হবে ১৫ হাজার কোটি টাকা [*বাংলা ট্রিবিউন, ০৩/০৬/২০২৪*]।

Global Financial Integrity (GFI) প্রতিবেদন বলছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে গড়ে ৬৪ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। তাদের হিসেবে, ২০১৬ থেকে ২০২০, এই ৫ বছরে পাচার হয়েছে তিন লক্ষ বিশ হাজার কোটি টাকা।

পাচারকৃত টাকার পরিমাণ বিবেচনায় দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ। Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) এর মতে, আমদানি-রপ্তানির সময়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন, বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়েছে। অর্থ পাচার রোধে সরকারের কিছু নীতিমালা থাকলেও এর সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়নের অভাবে অর্থ পাচার রোধ সম্ভব হচ্ছে না [*সময় নিউজ: ১৪/০৫/২০২২*]।

ঘ. ট্যাক্স-ভ্যাটের চাপ কমানো হোক

চলতি অর্থবছরে মুসক বা ভ্যাট ছিল মোট রাজস্বের ৩৮% যা এই অর্থবছরে হতে পারে ৫০% ওপরে। আইএমএফ এবার সবক্ষেত্রে ভ্যাট নির্বিচারে ১৫% করে দিতে সরকারকে চাপ দিচ্ছে এবং সরকার সে পথেই এগুচ্ছে। সব সময় সাধারণ মানুষের ওপরে গিয়ে বর্তায় এবং এই মূল্যস্ফীতির যুগে তা আরও বোঝা হয়ে যাবে। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আয়কর ফাঁকি দেবার প্রবণতা রোধ না করে রাজস্ব আদায়ের সহজ হাতিয়ার হিসেবে সরকার ভ্যাটের হার ও আওতা বাড়াচ্ছে। এটি নিবর্তনমূলক।

আয়করের আদায়ে সরকাররে দ্বৈত নীতির কারণে কর ফাঁকির প্রবণতা বাড়ে। সরকারি চাকরজীবীদের জন্য বিভিন্ন ভাতা আয়করমুক্ত থাকলেও বেসরকারি চাকরিজীবীদের জন্য সাড়ে চার লাখ টাকার সীমা বেঁধে দেয়া আছে। বিনিয়োগের উপর কর রেয়াত ছিল, কিন্তু এসব সুবিধা উঠিয়ে দিলে নিম্ন আয়ের করদাতাদের উপর চাপ বাড়বে। এসব দ্বৈত আইন বাতিল করতে হবে। নিম্ন আয়ের উপর কর কমিয়ে উচ্চ আয়ের উপর কর বৃদ্ধি করতে হবে। [*প্রথম আলো: ০৫/০৫/২০২৪*]

ঙ. খেলাপি ঋণ ব্যাংকিংয়ে অস্থিরতা ও বিনিয়োগ সংকটের কারণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ৩ মাসে (জানু-মার্চ, ২০২৪) খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩৬,৬৬২ কোটি টাকা এবং এ বছর মার্চের শেষে মোট খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ ৮২ হাজার কোটি টাকা, যা বিতরণ করা মোট ঋণের ১১.১১%। ২০১৫ সালে খেলাপি ঋণের (৫০ হাজার কোটি টাকা) তুলনায় বর্তমান খেলাপি ঋণ প্রায় ৪ গুণ।

খেলাপি ঋনের দুর্নাম ঘোঁচাতে প্রতিবছর ঋণের অবলোপন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকগুলো গত ২০ বছরে (২০০৩-২০২৩) ৬৭ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ অবলোপন করেছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোতে যেমন তারল্য সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি অন্য সাধারণ ব্যবসায়ীদের জন্য ঋণ প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। খেলাপি ঋণের পেছনে বেশিরভাগই ক্ষমতাবানদের হাত থাকায় তা যথাযথভাবে আদায় হচ্ছে না। অন্যদিকে, সামান্য ঋণের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষকদের জেলেও যেতে হচ্ছে [*ডেইলি স্টার বাংলা: ০৬-জুন'২৪; পেসেঞ্জার ভয়েস: ২৫-জুন'২৪*]।

সম্প্রতি সরকার আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দূর্বল ব্যাংকগুলো একিভুত করার উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা মনে করি, ঋণ খেলাপিদের সুযোগ করে দিতেই এই একিভুতকরনের ব্যবস্থা। দুর্বল ব্যাংকগুলোর দুর্বল হওয়ার পেছনে বাজারভিত্তিক কোনো কারণ নেই। শুধু সুশাসনের অভাব আর আইন প্রয়োগের অবহেলাই এর জন্য দায়ী। অধিকাংশ দুর্বল ব্যাংকই শুরুতে সবল ব্যাংক হিসেবেই ব্যবসা করছিল। সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয় ঋণ বিতরণের মাধ্যমে এসব ব্যাংককে দুর্বল ব্যাংকে পরিণত করা হয়েছে [*প্রথম আলো: ১৫/০৪/২০২৪*]।

চ. আমাদের সুপারিশ

১. ব্যাংক লুট, অর্থপাচার, দুর্নীতি ও চোরাচালান রোধে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে।

৩. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো যাতে প্রকৃত আয় গোপন করতে না পারে তার জন্য বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে এবং এদের অডিট রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। পুঁজি পাচার তো বটেই, মুনাফা নিয়ে যাবার ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ডোমেস্টিক রেগুলেশনের আওতা বাড়াতে হবে।

৪. বিভিন্ন দেশের সাথে তথ্য আদান প্রদান ও ব্যাংক লেনদেনের স্বচ্ছতার উপর আন্তদেশীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. সরকারের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা জোরদার করতে হবে এবং পূর্বের অডিট আপত্তির বিপরীতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. বাংলাদেশি নাগরিক বা কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশির বিদেশে সম্পদ ও ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে প্রতি বছর ব্যাংক বিবরণী দিতে হবে। তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. বিদেশিদের চাপে ভর্তুকি না কমিয়ে সরকারি বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে ঘাটতি সমন্বয় করতে হবে।

৮. বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করার জন্য 'পাবলিক এক্সপেন্ডিচার রিভিউ কমিশন' গঠন করতে হবে।

৯. প্রত্যক্ষ কর ফাকি রোধে রাজস্ব বোর্ডকে শক্তিশালী, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত করতে হবে। পরোক্ষ কর বা ভ্যাটের উপর রাজস্বের নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। বেনামী সম্পদ কেনা বন্ধ করতে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ, বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি)
সচিবালয়: বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলোডি, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ইমেইল: info@equitybd.net, ওয়েব: www.equitybd.net